মুহূর্তের মহাসঙ্গ: শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বইপড়া বেরিয়ে পড়া

কফি হাউসে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তত দিনে 'কুয়োতলা' উপন্যাস ছাড়িয়ে 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'সোনার মাছি খুন করেছি' এবং সর্বোপরি 'ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো' ইত্যাদি নতুন ভাষার কাব্যগ্রন্থ ও চমকপ্রদ কবিতায় ক্রমশ হুলস্থুল ফেলে দিচ্ছেন। বা হয়তো এর সব ক'টি বই-ই তখনও প্রকাশিত হয়নি। সেই জানা-অজানা কবিকৃতি ছাপিয়ে তাঁর মদ-মত্ত চেহারাটা তখনই প্রায় কিংবদন্তি হয়ে উঠেছে।

বাংলা কবিতার নতুন সেই তরঙ্গে তৃণসম আমি তখন তৈরি করছি ক্ষীণতনু একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি। কলেজের হাত খরচ বাঁচিয়ে ৬০ টাকায় ছাপা বাঁধাই হয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিপত্র থেকে আমার সেই প্রথম কবিতা বই 'বিক্ষত অন্বেষণ' প্রকাশিত হল। সেই দীর্ঘ কবিতার দু'টি টুকরোর একটা দেশ-এ আরেকটা পরিচয়-এও বেরিয়েছে একই সময়ে, বইটি প্রকাশের সঙ্গেই।

সকাল থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়া, বাড়িতে রাত জেগেও বই, কিংবা কবিতা লেখা-মোছা আর বিকেল থেকে কফিহাউস। বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত নিত্যনতুন পত্রিকার কল্পনা। আর হুটহাট বেরিয়ে পড়া।

এরকমই একদিন কফিহাউসের সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নামছি, শক্তি চট্টোপাধ্যায় উঠছেন। আমাকে থামিয়ে বললেন, 'যাচ্ছ কোথায়? চলো, ওপরে চলো।'

তখনও আমার শক্তিদা বলা শুরু হয়নি। বললাম, 'ওপরে ছিলাম এতক্ষণ। একটু সাগরের হাওয়া লাগিয়ে আসি মাথায়। দিঘায় ঘুরে আসি।'

'দিঘায় যাবে কেন? কাঁথি থেকে একদিকে দিঘা, আরেক দিকে জুনপুট। দিঘার ওদিকে না গিয়ে সোজা জুনপুট চলে যাও। মরুভূমির মতো বিরাট সৈকত। জনমানবহীন। এক পাশে গাছপালার মধ্যে সরকারি ফিশারিজের ছোট ছোট কয়েকটা কোয়ার্টার। কাঁথি থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার।

হাওড়ায় গিয়ে সামনেই যে-ট্রেনের টিকিট পেলাম, সেই ট্রেনেই খড়্গপুর। সেখান থেকে দিঘার বাসে কাঁথি। রিকশাওলার সঙ্গে কথা বলে তার রিকশায় পৌঁছে গেলাম জুনপুটে।

থাকি কোথায়?

রিকশাওলা দূরে জনশূন্য মাঠের মধ্যে একটা কুঁড়েঘর দেখিয়ে বলল, ওই আমার ঘর। এই নিন আমার ঘরের চাবি। আপনি এগোন, আমি আর একটা ট্রিপ দিয়েই

ফিরে আসছি।

রিকশাওলাকে হেসে নিরস্ত করে কাছেই একটা পরিত্যক্ত বিরাট বাংলো দেখলাম। মালিকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে, খানিকটা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করে রাতের আশ্রয় মিলল। বাংলোর সামনের দেওয়ালে মস্ত দরজা, তার দু'পাশে গোলাকার বড় বড় দুটো বাতায়ন। দরজায় পাল্লা নেই, জানলাও নরকরোটির অক্ষিগোলকের মতো শূন্য। অগত্যা নিদ্রা-অনিদ্রায় মেশা রাত শেষ হবার অনেক আগে শক্তিদার মরুভূমিতুল্য বালুকাবেলায় নেমে পড়ি। বহু দূরে সমুদ্রের দিকে হাঁটছি, কিসে একটা হোঁচট খেলাম। বালি ঝেড়ে চোখের সামনে নিয়ে দেখি, সেটা সত্যিকার একটা নরকরোটি।

সমুদ্রের ওপর এক ঝাঁক জোনাকি দেখে বিস্মিত। সমুদ্রে জোনাকি? আরও কাছে যেতে নোঙর করা আট-দশটা নৌকো চোখে পড়ল। সৈকতে বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের আসা-যাওয়ায় নৌকোর আলোগুলো দুলছে। দূর থেকে এক ঝাঁক জোনাকিই মনে হয়েছিল।

সবই জেলেনৌকো। সবাই এরা মাছ ধরতে যাবে। দূরে ডাঙার ওপর তাদের জন্যই অত রাতে খোলা একমাত্র দোকান থেকে সারাদিনের দরকারি সামগ্রী কিনে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

একটা জেলে-নৌকোয় চড়ে বসলাম। সেটা সন্তোষমাঝির নৌকো। জেলে-নৌকোয় সেই আমার প্রথম সমুদ্র অভিযান। আন্টার্কটিকায় সমুদ্র অভিযান তখনও বহু দূর।

কবিতায় ফেরা

তখন 'নিরন্তর' নামে দ্বিতীয় দীর্ঘ কবিতায় ডুবে আছি। বার বার কেটে, লিখে, শেষ অব্দি বছর কয়েক পর চূড়ান্ত হল সেই কবিতা। পল ক্লদেলের কাব্যভাষারীতির অনুসরণে রচিত ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত স্যাঁ জন পার্সের 'আনাবাজ' তখন আমাকে পাগল করে রেখেছে। সেই বছরই আন্দ্রে ব্রেতঁ-র 'মানিফেস্তো দ্য সুররিয়েলিজম' ফরাশি শিল্পে ও পরে ক্রমশ সাহিত্যে প্রভাব বিছোতে শুরু করলেও স্যাঁ জন পার্স ক্লদেলের প্রভাবে অনেকটা 'বিব্লিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অব সিনট্যাক্স' আনছেন তাঁর দীর্ঘকবিতা 'আনাবাজ'-এ। কবিতার ওই উচ্চাবচ গদ্যরীতির অভ্যন্তর আলোড়নেই হয়তো নির্মাণ করা হয়েছে 'নিরন্তর'-এর বাক্যবিন্যাসের স্বরধ্বনি। বাংলা কবিতায় অপ্রচলিত এ এক অচেনা কাব্যভাষা হয়তো। আমার বন্ধু মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ে মুগ্ধ। 'কবি ও কবিতা'র সম্পাদক, আমাদের দু'জনেরই শিক্ষক জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মৃণালের মুখে এই কবিতার কথা শুনে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আমার কাছে চেয়ে পাঠালেন। এদিকে সামনেই সিগনেট-খ্যাত দিলীপকুমার গুপ্ত ও আমার একত্র সম্পাদনায় 'সারস্বত প্রকাশ'-এর পরিকল্পনা চলছে। ঠিক করলাম, 'নিরন্তর' সর্বৈব ব্যর্থ রচনাও যদি হয় তবু বাংলায় খুব অভিনব ও অনন্য একটি কাব্যভাষার নমুনা হিসেবে সারস্বত প্রকাশের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়া দরকার।

এর মধ্যে একদিন 'মোহেঞ্জোদরো' পত্রিকার সম্পাদক আমার বন্ধু সমীর রায়

কফিহাউসে এসে কবিতার খাতাটা পড়তে লাগল। আমি 'ল্যাভেটরি' গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি নিরন্তর-এর একটা পর্ব ছেঁড়া। সমীর আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া পাতা দুটো দেখিয়ে বলল, মোহেঞ্জোদরো-র জন্য নিয়ে গেলাম। আমি তেড়ে গিয়েও তাকে ধরতে পারলাম না।

মনের দ্বিধা তবু ঘোচে না। এক তো নিজের পত্রিকায় নিজেরই কবিতা ছাপা ঠিক হবে কি না সেই সংশয়, তার ওপর এই প্রবল দ্বন্দ্ব, এটা কি আদৌ কবিতা হয়েছে?

সেদিন কফিহাউসে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে দেখেই মনে হল, কবিতাটা ওঁকেই একবার শোনানো দরকার। বিশেষ করে এই জন্য যে, ছন্দ-মিল ছাড়া কবিতা ওঁর পছন্দ না। নিজের বিষয়েও বলতেন, আমি পদ্য লিখি। কথা হল, পরদিন বেস্পতিবার সন্ধেবেলা কফিহাউসে বসবে ওই কবিতার বিচারালয়। আমি পড়ব, আর তরুণদের মধ্যে তখনই হইচই ফেলা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় শুনবেন।

রাত ন'টায় কফিহাউস বন্ধ হবার আগে পর্যন্ত টানা আধটা ঘণ্টাও পাওয়া গেল না যখন আমাদের দু'জনের টেবিলে কেউ না কেউ এসে পাঠে ব্যাঘাত ঘটাল না।

ন'টায় কফিহাউস বন্ধ। শক্তিদা বললেন, চলো, ওয়াইএমসিএ-র একতলার রেস্তোরাঁয় যাই। ওখানে নির্ঝঞ্ঝাট শোনা যাবে।

পর্দাঢাকা একটা কেবিনে ঢুকে গোড়া থেকে আবার পড়া হল আমার সেই অনিশ্চিত কবিতা 'নিরন্তর'। শেষ লাইনের শেষ শব্দ পর্যন্ত শুনে শক্তিদার তাৎক্ষণিক মন্তব্য— এত বড় লেখা, একটাও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে হয়নি!

এর কিছুদিন আগে বা পরে একদিন দেখা হতেই বললেন, কবিতা-পরিচয়ের সব ক'টা সংখ্যা আমাকে দিতে পারো? আমাকে যেগুলো দিয়েছিল, সেগুলো হাতের কাছে নেই।

যে সপ্তাহে দিলাম, তার এক সপ্তাহ পর আনন্দবাজার পত্রিকার মঙ্গলবারের 'কলকাতার কড়চা'য় কবিতা-পরিচয় নিয়ে আলোচনা বেরল।

শাদা ঘোড়া

১৯৭৪ সালেই সম্ভবত, শক্তিদা একদিন বললেন, 'শোনো অমরেন্দ্র, আমি সোমবারের আনন্দমেলার দায়িত্ব পেয়েছি। ধারাবাহিক কিছু লিখতে পারো?'

তখন আনন্দবাজারে শেষ পৃষ্ঠা জুড়ে প্রতি সোমবার বেরত আনন্দমেলা।

ঘটনাচক্রে ছ'মাস আগেই 'শাদা ঘোড়া' নামে একটা রূপকথা শেষ করেছি। অনেকটাই একালের। শেষ অনুচ্ছেদের শেষ কয়েক পংক্তি তখনও মনের মতো হয়নি, ছ'মাস ধরে মাঝেমাঝেই সেই শেষটুকু শুদ্ধ করার জন্য কাটাকুটি চলছে। আশ্চর্যের কথা, গল্পটার শুরুর অনুচ্ছেদও ছ'মাস ধরে নানা ভাবে লেখার পর প্রথম বাক্যটি লিখতে পেরেছিলাম— 'আমার একটা ঘোড়া আছে।'

শেষ অনুচ্ছেদ শেষ হবার পর লেখাটা শক্তিদার হাতে তুলে দিলাম।

দুয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সোমবারের আনন্দমেলায় 'শাদা ঘোড়া' ছাপা শুরু হল। সঙ্গে অসিত পালের আঁকা চমৎকার ছবি।

পরের বছর ১৯৭৫ সালে একদিন বললেন, ইন্দিরার জরুরি অবস্থায় খবরের কাগজের অনেক লেখাই রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বাতিল করে দিচ্ছে। জায়গা ভরতে নতুন নতুন ফিচার শুরু হচ্ছে। এরকম একটা ফিচার 'গ্রামগঞ্জের কড়চা'য় নিয়মিত লিখতে হবে তোমাকে।

খবরের কাগজে নিয়মিত ফিচার লেখায় আমার মন সায় দেয় না। পরে অবশ্য লিখতে হয়েছে। একটা বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা আধিকারিকের চাকরি, ভালো মাইনে ও সর্বক্ষণের গাড়ি ছেড়ে শুধু মন খুঁড়ে নিজের লেখা লেখবার সময় বের করতে এসে সামান্য অর্থের প্রয়োজনে কখনও মাসিক, কখনও সাপ্তাহিক, পরে 'যুগান্তর'-এ তো দৈনিকও লিখেছি। দায়ে পড়ে সেসব লিখতে লিখতেই বুঝেছি, নিজের সৃষ্টিকর্ম ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও কাজই পছন্দের কাজ হতে পারে না।

আনন্দবাজারের 'গ্রামগঞ্জের কড়চা'য় আমার গ্রামে ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে তিন নদী ঘেরা এক গ্রামের কথা লিখি, যেখানে নদীর নোনা জল ঠেলে বাঁধ দিয়ে গ্রামের প্রথম স্কুল তৈরির অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম আমি। সুন্দরবনের বিধবাদের গ্রাম, লালগোলায় জেলেদের গ্রাম, বহরমপুরের কাঁসারি পাড়া— এইসব পথচলতি দেখা নিয়ে দু'চারটে লেখার পর আর লেখা হয়নি।

শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দুটো পয়সার জন্য এই সব কাগজের লেখালেখি, এও তো আমার মনের কাজ নয়।

বছরের পর বছর কাটে, আমাদের চোখের সামনে একের পর এক নতুন নতুন কবিতায় চমকে দেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

একদিন যোগব্রত চট্টোপাধ্যায়ের হাতে চিরকুট পাঠালেন।

প্রিয় অমর

সাপ্তাহিকটা[১] আবার বের করছি। সেজন্যে তোমার গ্রাহক List-টা একদিনের জন্যে আমার ভীষণ দরকার। আর একটা কবিতা যোগব্রতকে দিও আমার জন্যে। ভালোবাসা নিও।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যোগব্রত প্রতিবছর পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রসদনের সামনে ট্যাবলয়েড সাইজের কবিপক্ষ বা ওই রকম কোনও নামে পত্রিকার বিরাট বান্ডিল নিয়ে হাজির থাকবেই।

এক বর্ষায় পুকুর ও বাড়ির পথ একাকার হওয়ায় যোগব্রত জলে ডুবে মারা যায়। শুনলাম সেদিন অধিক মদ্যপান করেছিল।

কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের লাগোয়া একটা গলির এক চিলতে কুঠুরিতে জ্যোতি পাঠকের শখের প্রকাশন সংস্থা ছিল 'স্বরলিপি'। যতদূর মনে পড়ে, 'সন্তোষকুমার ঘোষের সমস্ত গল্প' দিয়েই স্বরলিপির যাত্রা শুরু। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিতব্য বইটির নামকরণ প্রকাশকের অনুরোধে ও লেখকের দাবিতে আমাকে করতে হয়েছিল। কবি-সাহিত্যিকসঙ্গ-পিপাসু জ্যোতির ঐকান্তিক নিমন্ত্রণে সন্তোষকুমার ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি

[১] *শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতা সাপ্তাহিকী'।*

চট্টোপাধ্যায়দের মতো মাঝে মাঝে আমাকেও স্বরলিপিতে যেতে হত।

যোগব্রত মারা যাবার কয়েক দিন পর এক সন্ধেয় শক্তিদা এসে হাজির। এসেই খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে গান ধরলেন— 'ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না।' সেদিন একটার পর একটা গান গাইলেন। গলা খুলে সেই গাঢ় স্বরের বাঁধন ছেঁড়া গান আমার বুকের শিরায় মোচড় দিচ্ছিল মনে আছে।

১৯৬৭-৬৮ সালে আমি আর দিলীপকুমার গুপ্ত 'সারস্বত প্রকাশ'-এর সম্পাদক। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে একগুচ্ছ কবিতা দেবার আমন্ত্রণ তো জানাতেই হবে। সামনাসামনি না বললে লেখার কথা ওঁর মনে থাকবে কি? এদিকে কফিহাউসে যাবার সময় তখন অনেকটাই কমে গেছে আমার। তার মধ্যেই একদিন শক্তিদাকে পেয়ে পাঁচটি কবিতা দেবার কথা বললাম। কবিতা দেবার দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল।

আনন্দের পাশাপাশি দুঃখের ঘটনাও জীবনে হামেশাই ঘটে। কবিতা দেবার যে দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল, সেদিন সেই সময়ে আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটা দুষ্প্রাপ্য বই পেয়ে তাতেই আটকে গিয়েছিলাম। সারস্বতের অফিসে ফিরে দেখলাম, শক্তিদা পাঁচটি কবিতা রেখে গেছেন ও সঙ্গে এই চিঠি:

প্রিয় অমরেন্দ্র

তোমার জন্যে আধ ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করলাম। কোথায় গেছো? তোমার কি সেদিনের করা এ্যাপয়েন্টমেন্ট মনে ছিলো না? কথা ছিলো ৩.৩০মি থেকে ৪টের মধ্যে আসবে। যাই হোক, অনেকগুলো পদ্য দিয়ে গেলাম। ভালো হতো দেখা হলে— পাঠোদ্ধার করতে যদি কষ্ট হয় বা যদি সেকারণেই ভুল ছাপা হয়, তাহলে কিন্তু দোষ আমার নয়। আমি আমার কথামতন ঠিক এসেছিলাম। পরে কোনোদিন আসার চেষ্টা করবো। প্রীতি নিও

ইতি
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
২৪.৫.৬৮

যতদূর মনে পড়ে ১৯৮৮-তে একবার ক'দিনের জন্য নেপালে গিয়ে আমার গৃহকর্ত্রী প্রবল জ্বরে পড়েন। ওখানকার বিলেতফেরত নেপালি ডাক্তার ভাইরাল ফিভার ডায়গনোসিস করে এক গাদা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে গেলেন। সেইসঙ্গে ঘরের জানলা চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ রাখার নিদান দিলেন, এক ফোঁটা হাওয়াও যাতে ঘরে না ঢোকে। এদিকে রোগীর অবস্থা এখন-তখন। ওই অবস্থায় সিকিউরিটি চেকিং ছাড়াই রোগীকে প্লেনে তোলা হল। কলকাতায় ফিরে সেই যে শোয়ার ঘরে একটা ইজি চেয়ার পেতে শুইয়ে দেওয়া হল, মাসখানেক ওভাবেই কাটল। অ্যালোপ্যাথ-হোমিওপ্যাথ দুই ডাক্তারই ম্যালেরিয়া বুঝে চিকিৎসা করতে থাকায় কিছুটা নিশ্চিন্ত।

এদিকে পরপর দু'দিন অফিসের কাজে সম্পূর্ণ বিনিদ্র কাটিয়ে তৃতীয় রাতে বারোটা নাগাদ শুয়ে পড়েছি। ছোট বোনকে বলা আছে যে রাতে কেউ এলে বলবে আমি দু'রাত ঘুমোইনি, এখন ঘুমিয়ে পড়েছি। পাশেই গৃহিণী তাঁর আরামকেদারায় শুয়ে আছেন, আমি খাটের বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছি। এমন সময় শুনি স্বয়ং

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'ওঠো অমরেন্দ্র, আমি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় এসেছি।'

আমি বললাম, 'তা কী করে সম্ভব? আপনি সশরীরে এলেন কীভাবে?'

'ওঠো, উঠে পড়ো, চোখ খুলে দেখো আমি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়।'

বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন, মনে মনে খুশি, ওঁর সঙ্গে 'কপাল কুণ্ডলা', 'কমলাকান্তের দপ্তর' আর 'কৃষ্ণ চরিত্র' নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।

কথাটা বলতে যাচ্ছি, তার মধ্যেই আমার মাথাটা জোরে নাড়াতে নাড়াতে বলতে লাগলেন, 'ওঠো, ওঠো, উঠে বসো। চোখ মেলো। আমি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়!'

ঘুম ভেঙে ঝট করে উঠে বসলাম। শুনলাম, 'অমরেন্দ্র, আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বাইরের ঘরে চলো, একটু বসি।'

আমার বোন কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, অনেক বলেও আটকাতে পারলাম না।

'ও ঠিক আছে।' বলে বাইরের ঘরে এসে দু'জনে বসতেই শক্তিদার কথা— 'তোমার কাছে হুইস্কি আছে?'

আধ বোতল হুইস্কি ছিল। উঠে গিয়ে বোতলটা এনে দুটো গ্লাসে ঢাললাম। জল মিশিয়ে গেলাস শক্তিদার হাতে দিতে কয়েকটা চুমুক দেবার পর বললেন, 'তোমার গ্লাসটা গাঢ়তর দেখাচ্ছে না?' আমার গ্লাসের হুইস্কিও শক্তিদার গ্লাসে ঢেলে দিলাম। গ্লাস শেষ করে বললেন, 'তোমার কাছে একশোটা টাকা আছে? মোড়ে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।'

একশো টাকা এনে দিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দরজায় দাঁড়ানো সিকিউরিটিকে বললাম, 'সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিয়ে এসো।'

এক পাগল প্রতিবেশীর যখন-তখন আমাদের গাছসুদ্ধ টব ভাঙার নেশা। গাছ বাঁচাতে তখন দরজায় সিকিউরিটি রাখতে হত।

শক্তিদা দু'-তিন ধাপ নেমেছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ? মোড়ে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রাখিনি ভাবছ?'

'একেবারেই তা ভাবছি না। আপনি সাবধানে নামুন।'

'কালই তোমাকে টাকাটা দিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'তার দরকার নেই। আপনার নতুন কবিতার বই বেরলে এক কপি উপহার দেবেন।'

পরে একদিন শঙ্খবাবুর ছোট মেয়ে টিয়ার বিয়েতে আমাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন। বললেন, 'শোনো আমি খুব শিগগিরই আনন্দবাজার থেকে রিটায়ার করছি। কবিতা-সাপ্তাহিকীটা আবার করব। এবার একটু বড় করে। তোমাকে সঙ্গে পেলে কাগজ দাঁড়িয়ে যাবে। একদিন যাব তোমার কাছে। অনেক কথা আছে।'

কয়েক বছর হয়ে গেছে সেই কথা আর হয়নি। এখন আমার সঙ্গে নয়, দুঃখী, প্রেমিক মানুষের সঙ্গে তাঁর অনন্ত কথা। আমি শুনি ছাপার অক্ষরে।

'কালের কষ্টিপাথর', হৈমন্তী সংকলন ১৪২৬